গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা | ২১ - ২৭ মার্চ ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

রাজ্য জুড়ে আইন অমান্যের ডাক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

৩ এপ্রিল

বেকারি মূল্যবৃদ্ধি আর সীমাহীন দুর্নীতিতে জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। চূড়ান্ত আর্থিক দুর্দশা দেশের কোটি কোটি মানুষকে অনাহার-অর্ধাহারের এমনকি আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে চরম দুর্নীতি। আর জি কর কাণ্ডেঅভয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু ও তার বিরুদ্ধেঅবিস্মরণীয় গণআন্দোলন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতির ভয়ঙ্কর চেহারা প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। দুর্নীতি শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই নয়, শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা কয়লা পাচার, গরু পাচার, শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে দুর্নীতি-দলবাজি, রেশন, আবাস যোজনা দুর্নীতি, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি সহ পঞ্চায়েত, পৌরসভা থেকে শুরু করে সরকার ও প্রশাসনের সর্বস্তরে আকণ্ঠ চুরি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। মানুষের প্রতিবাদকে যে কোনও উপায়ে দাবিয়ে রাখার জন্য সরকারি দলের সীমাহীন সন্ত্রাস, হুমকি ও দৌরাত্ম্য আজ চুরি দুর্নীতির অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।

গরিব নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তানদের শিক্ষা প্রায় উঠে যেতে বসেছে। প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষায় কার্যত নৈরাজ্য চলছে। রাজ্য সরকার ৮২০৭টি প্রাথমিক স্কুল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে গোটা শিক্ষাক্ষেত্রকে লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা লুঠের বাজারে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয়, দেশের বুকে রামমোহন

দুয়ের পাতায় দেখুন

দাবি

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সহ সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হুমকি সংস্কৃতি, বেকারি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রদ এবং সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার কার্বন কপি রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সার, বিদ্যুৎ, সহজ শর্তে ঋণ সহ উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা, নয়া বিদ্যুৎ নীতি ও স্মার্ট মিটার বাতিল, ফসলের ন্যায্য মূল্য, সমস্ত বেকার ও খেতমজুরদের কাজ, অভয়া এবং মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় নিগৃহীত ছাত্রীদের ন্যায়বিচার।

মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় ছাত্রীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ১১ মার্চ সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে পুরুলিয়ায় মিছিল

স্মার্ট মিটার বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ১-৭ এপ্রিল প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সর্বভারতীয় কনভেনশনে

১৬তম ও ১৭তম লোকসভাতে পাঁচবার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ (সংশোধনী) বিল উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু পাশ করাতে পারেনি সরকার। এটা বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনের একটা বিরাট জয়। ৫ মার্চ দিল্লির শাহ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশনে এ কথা বলেন, উত্তরপ্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও অল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শৈলেন্দ্র দুবে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, বিদ্যুতের ব্যবহার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে কম দামে বিদ্যুৎ কিনে অত্যন্ত বেশি এনার্জি চার্জ, লোডভিত্তিক পাওয়ার পারচেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট সারচার্জ, পেনশন সারচার্জ, কোথাও অন্যান্য নানা চার্জ বা সারচার্জ বসিয়ে দিল্লিতে টাটা পাওয়ার ও রিলায়েন্স পাওয়ার

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লির যন্তর মন্তরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশনে প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ। ৪ মার্চ

মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণে

১৪ মার্চ সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মহান কার্ল মার্ক্সের ১৪৩তম স্মরণদিবস দেশ জুড়ে পালিত হয়। এই উপলক্ষে দলের সমস্ত দফতরে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ (ছবি)।

- মণিপুর সমস্যা ঃ পৃষ্ঠা ৩
- বিদ্বেষের রাজনীতিই পুঁজি ঃ পৃষ্ঠা ৪
- মার্ক্সের প্রতি এঙ্গেলসের শ্রদ্ধার্ঘ্য ঃ পৃষ্ঠা ৫

ভোটের লোভেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নগ্ন প্রতিযোগিতা

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দলের বিধায়ক-মন্ত্রীদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নগ্ন প্রতিযোগিতার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৫ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

বিরোধী দলনেতা ও মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দলের বিধায়ক-মন্ত্রীরা যে ভাবে কে কতখানি হিন্দু বা মুসলিম তা প্রমাণ করার নগ্ন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, তা এ রাজ্যের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী ২৫০ কোটিরও বেশি সরকারি অর্থ ব্যয় করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দীঘায় মন্দির তৈরি করছেন যা আগামী ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন হবে। বিরোধী দলনেতা তার পাল্টা আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমীর দিন নন্দীগ্রামে অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে মন্দির তৈরির শিলান্যাসের ঘোষণা করে এক কোটি হিন্দুকে রাস্তায় নামার আহ্বান করেছেন। বিধানসভার অভ্যন্তরে বিজেপি ও তৃণমূল নেতাদের ভাষণে সাধারণ মানুষের সমস্যার পরিবর্তে কে কোন ধর্মের কতবড় পৃষ্ঠপোষক তা প্রমাণের দৃষ্টিকটু প্রতিযোগিতাই দেখা গেছে। অভয়ার ন্যায়বিচার, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা, চাকরি ও শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটই তাঁদের লক্ষ্য। জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, নিজেদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কার্যকরী সমাধানের দাবিতে এবং প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনার মাধ্যমে ভোটের স্বার্থ রক্ষায় এই দুই দলের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেঐক্যবদ্ধআন্দোলনে শামিল হোন।

সমীক্ষায় স্পষ্ট প্রায় ৭২ শতাংশ ভারতীয়েরই পকেট ফাঁকা

ভারতীয় অর্থনীতির নৌকা প্রবল গতিতে এগিয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্থান দখল করতে চলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী যত প্রচারই করুন, নানা সমীক্ষায় মাঝে মাঝেই সামনে এসে যাচ্ছে যে সেই নৌকার তলা আসলে ফেঁসে রয়েছে। ঠিক যেমন, ব্লুম ভেঞ্চার নামে একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে, ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে, ১০০ কোটি মানুষের কাছেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু কেনার পর ইচ্ছেমতো খরচ করার সামান্য পয়সাটুকুও থাকে না। এর মানে, দেশের প্রায় ৭২ শতাংশ মানুষেরই পকেট ফাঁকা! প্রধানমন্ত্রীজি, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এ কেমন চেহারা!

ব্লুম ভেঞ্চারের এই রিপোর্টে আবারও সামনে এসেছে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবল বৈষম্যের ছবি। পরিসংখ্যান দিয়ে সেখানে দেখানো হয়েছে, এ দেশে সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা বাস্তবে সে ভাবে বাড়ছে না। যা বাড়ছে তা হল, ইতিমধ্যেই যারা অতিধনী, তাদের সম্পদের পরিমাণ। অর্থাৎ মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য আরও তীব্র হচ্ছে।

সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে সব ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে, তার চাহিদা বাড়ছে না। কারণ সহজবোধ্য— সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই দু'বেলার খাবার আর বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু না হলেই নয় সেটুকু কেনার খরচ জোগাড় করতেই হিমসিম খাচ্ছেন। ফলে কোপ পড়ছে সাবান, শ্যাম্পু এমনকি বিস্কুটের মতো পণ্যের কেনাকাটাতেও। অন্য দিকে ব্যবসা বাড়ছে বড় কোম্পানির তৈরি ব্র্যান্ডেড পণ্যের। বিলাসবহুল বাড়ি, দামি ফোন ইত্যাদির বাজার বাড়ছে, অথচ বিক্রি কমছে মাঝারি থেকে কম দামের ফ্ল্যাটবাড়ি সহ সাধারণ জিনিসপত্রের। অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায় অর্থনীতির বিকাশের চেহারা ইংরেজি 'কে' অক্ষরের আকার নিচ্ছে, যার একটা বাহু ক্রমাগত উপরের দিকে ওঠে, আর একটা বাহু নেমে যায় নিচের দিকে। অর্থাৎ ভারতে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে আরও দারিদ্রের অতলে, আর ধনীরা হয়ে উঠছে আরও ধনী। ১৯৯০ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের ৩৪ শতাংশ ছিল ১০ শতাংশ অতিধনীর হাতে। বাড়তে বাড়তে তা এখন হয়েছে ৫৭.৭ শতাংশ। ওই সময়ে নিচের তলার ৫০ শতাংশ ভারতীয়ের দখলে ছিল মোট জাতীয় আয়ের ২২.২ শতাংশ, কমতে কমতে যা এখন পৌঁছেছে ১৫ শতাংশে। দেশের বিরাট অংশের মানুষের শুধু কেনার ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে তাই নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমার সাথে সাথে বাড়ছে টাকা ধার করার প্রবণতাও। কেন এমন হচ্ছে, তার উত্তর রাষ্ট্র পরিচালক, অর্থনীতির নীতি-নির্ধারকরা সহ সাধারণ মানুষের একটা অংশেরও এখন জানা। এর মূল কারণ, পুঁজিপতি শ্রেণির তীব্র শোষণের পরিণামে অর্থনীতিতে কার্যকরী চাহিদা কমে যাওয়া— অর্থাৎ প্রয়োজনীয় রোজগার না থাকার কারণে বেশিরভাগ মানুষের হাতে কেনাকাটার মতো টাকাপয়সা না থাকা। মানুষের হাতে টাকা নেই কেন? ভয়াবহ বেকার সমস্যা, ছাঁটাই, লে-অফ, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চালু সংস্থাগুলিতে কম শ্রমিক নিয়োগ করে অতিরিক্ত যন্ত্র-নির্ভরতা এর প্রধান কারণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর ব্যবহার এই বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

দেশের সরকার ও নীতি-নির্ধারকরা এ-ও জানেন যে, অতি-মুনাফার তীব্র লালসায় পরিচালিত চলমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। শোষণমূলক এই ব্যবস্থার নিয়মেই শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষকে লুঠ করে ধনী ক্রমে অতিধনী হয়, আর দেশে বাড়তে থাকে ক্রয়ক্ষমতাহীন নিঃস্ব সর্বস্বহারা মানুষের সংখ্যা।

সরকারগুলি একচেটিয়া পুঁজির একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে এ ভাবেই জনগণের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকেও পুঁজিপতিদের স্বার্থের কাছে বলি দিচ্ছে। তাই এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটেও কাজের সুযোগ তৈরি করে জনসাধারণের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা দেখা গেল না। বরং ব্যক্তিগত আয়করের সীমা বাড়িয়ে দেশের ধনী অংশের মানুষের হাতেই আরও টাকা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করল নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার। এ দিকে একশো দিনের কাজ প্রকল্প, যা দেশের বড় অংশের গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানে খানিকটা হলেও সাহায্য করে, সেখানেও বরাদ্দের পরিমাণ একই রাখা হল।

এই অবস্থায় জনস্বার্থবিরোধী এই সরকারকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাধ্য না করতে পারলে জীবনে আরও আঁধার ঘনিয়ে আসবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের। ফলে, সঠিক নেতৃত্বে জোট বেঁধে কর্মসংস্থানের দাবিতে, ছাঁটাই বন্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেই আন্দোলনের পথ ধরেই শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে, না হলে এই বৈষম্যের অবসান ঘটবে না।

আইন অমান্যের ডাক

একের পাতার পর

বিদ্যাসাগর জ্যোতিবারাও ফুলে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-সুভাষচন্দ্র সহ নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে এই শিক্ষানীতি পরিকল্পিতভাবে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক মনোভাব গড়ে তুলছে। রাজ্য সরকার মদ বিক্রিকে রাজস্ব আয়ের প্রধান উপায়ে পরিণত করেছে। ফলে যুব সমাজের মধ্যে মদ-মাদকের প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। নারীর অবমাননা, নির্যাতন, ধর্ষণ, প্রতিদিনের ঘটনায় পর্যবসিত। অন্যায় ভাবে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। তার বেশির ভাগ অংশ ধনকুবেরদের করছাড়, ঋণছাড়ে ব্যয় করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া বিদ্যুৎ নীতি, রাজ্য সরকারের বিদ্যুতের সীমাহীন মাশুল বৃদ্ধি এবং প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালু করার চেষ্টার ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম নেই। সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া। কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী কৃষি নীতি ও বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকরা সর্বস্বান্ত। নদী পরিকল্পনা নেই, প্রতি বছর রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। স্থায়ী নদী বাঁধের ব্যবস্থা নেই। খেতমজুরের কাজ নেই। একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে। চা বাগানের শ্রমিক, কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক, কাজ না পাওয়া বেকার যুবক জীবনযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। দিশাহারা কেউ কেউ আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রতি বছর ২ কোটি করে নতুন চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা খনি সহ লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিলগ্নিকরণের নামে প্রায় বিনামূল্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিপুল পরিমাণ সরকারি চাকরির পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। সরকারগুলি নিয়োগ না করায় বেকাররা হাহাকার করছে। দেশে বেকারির সংখ্যা স্বাধীন ভারতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে।

কর্মীর অভাবে সারা দেশে রেলের নিরাপত্তা, যাত্রী পরিষেবা বিপর্যস্ত। ট্রেনের ভাড়া বাড়ছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। অভয়ার ন্যায়বিচার এখনও অধরা। কেন্দ্র-রাজ্যের যোগসাজশে একদিকে ন্যায়বিচার উপেক্ষিত, অন্য দিকে এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধেমিথ্যা অভিযোগে চলছে সরকারি হেনস্থা। শিক্ষামন্ত্রীর কনভয় প্রতিবাদী ছাত্রের ওপর দিয়ে চালানোর ঘটনা ঘটেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছাত্রীদের ওপর মেদিনীপুর কোতোয়ালি মহিলা থানায় অকথ্য অত্যাচার করে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলেছে।

অন্য দলগুলি যখন জনজীবনের এই দুর্বিষহ অবস্থা দেখেও নির্বিকার, যখন ক্ষমতার গদি দখলের লোভে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে সমাজে সম্প্রীতির পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে, ধ্বংস করছে মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার লড়াইকে তখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত অন্যায় অত্যাচার অপশাসন ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে, অন্য দিকে পুঁজিবাদী নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আজ যখন বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসক দলগুলি সরকার পরিচালনায় জনগণের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং জনস্বার্থের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাই তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে তখন জনগণের ন্যূনতম দাবি আদায় করতেও তীব্র গণআন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। তার জন্য প্রয়োজন একেবারে নিচের তলা থেকে জনসাধারণের উদ্যোগে গণকমিটি গঠন এবং গণউদ্যোগ তথা জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া। একমাত্র এই রাস্তাতেই যে কোনও অন্যায় অত্যাচার দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করে দেওয়া সম্ভব। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের অসহনীয় শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন, যুদ্ধের অভিশাপ মুক্তির উপযোগী বিপ্লবী আন্দোলনের জমি তৈরি হতে পারে গণআন্দোলনের পথেই।

সেই লক্ষ্যেই কলকাতা মহানগরীর বুকে ২১ জানুয়ারি ঐতিহাসিক মহামিছিল সংগঠিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ৩ এপ্রিল রাজ্যের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, আইন অমান্য সংগঠিত হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলিকে প্রতিরোধের পাশাপাশি প্রতিটি জেলার নিজস্ব দাবিগুলি মানতে বাধ্য করার লক্ষ্যে ওই দিন সমস্ত জেলাশাসক দপ্তর অভিযান ও আইন অমান্য সংগঠিত হবে। আন্দোলনকে সুসংগঠিত এবং তীব্রতর করার লক্ষ্যে এই বিক্ষোভ আইন অমান্য কর্মসূচিকে সর্বাত্মক সফল করতে রাজ্যের মানুষ নিশ্চয় অতীতের মতো সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন এআইডিএসও জেএনইউ ইউনিটের

৮ মার্চ দিল্লিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করল এআইডিএসও-র জেএনইউ ইউনিট। এই উপলক্ষে উপস্থিত সকলকে বিশেষ ব্যাজ পরানো হয়। 'প্রতিরোধে মহিলারা'— বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এআইএমএসএস নেত্রী, শাহিনবাগ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড রিতু কৌশিক, এআইডিএসও-র দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া প্রমুখ।

আর জি কর আন্দোলন উপলক্ষে রচিত একটি গান পরিবেশন করেন জেএনইউ-এর ছাত্রী অনুপ্রভা। শেষে 'আরোহণ' সংস্থা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এআইডিএসও-র রাজ্য সহসভাপতি ও জেএনইউ-এর গবেষক কমরেড সুমন।

বক্তব্য রাখছেন এআইএমএসএস নেত্রী কমরেড রিতু কৌশিক

মণিপুর ঃ সমাধান চায় না বিজেপি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেই এগোতে হবে মানুষকে

সম্প্রতি গণদাবীর দপ্তরে এসেছিলেন কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত এক মণিপুরি যুবক। তাঁর কথায়— আমরা মণিপুরের মেইতেই কিংবা কুকি, নাগা ইত্যাদি সব সম্প্রদায়ের মানুষ কলকাতায় এক সাথে কাজ করি, এক মেসে মিলে-মিশেই থাকি। কিন্তু মণিপুরের সীমানায় ঢুকলেই আমরা পরস্পরের চরম শত্রু হয়ে উঠি! কেন এমন হয় বলুন তো? আশঙ্কা হচ্ছিল, তিনি নিজে মেইতেই সম্প্রদায়ের, তাই হয়ত কুকিদেরই তিনি এর জন্য দোষী করবেন! কিন্তু একেবারেই তা নয়, তিনি বলে চললেন— এর জন্য প্রধান দায়ী সে রাজ্যের বর্তমান এবং প্রাক্তন শাসক দল বিজেপি ও কংগ্রেসের ভূমিকা। নিজেদের সরকারি গদি রক্ষার স্বার্থে তারাই নানা ভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে এই জাতিদাঙ্গায়। এ কারণেই প্রায় দু'বছর ধরে মণিপুরে জাতিদাঙ্গার আগুন নেভেনি।

আজ আবার কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় মণিপুর নতুন করে জ্বলছে। মেইতেই-কুকি জাতিদাঙ্গার সমাধানের চেষ্টা দূরে থাক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর অতি বিশ্বস্ত রাজ্যপালকে সামনে রেখে গায়ের জোরে কাজ হাসিলের যে নিদান দিয়েছেন, তাতে এই দুই পক্ষের বিভেদ আরও বেড়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মণিপুরের বর্তমান রক্তাক্ত জাতিদাঙ্গার পিছনের কারণটি বোঝার জন্য এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। ভারত-বর্মা (বর্তমানে মায়ানমার) সীমান্ত এলাকার স্বাধীন রাজ্য মণিপুর ১৮২৪-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত হয়। ১৮৯১-এ ব্রিটিশরা মণিপুর দখল করে। রাজপুত্র টিকেন্দ্রজিৎ সিং ও তাঁর সেনাপতিদের ইম্ফলের মাটিতে ফাঁসি দেয় তারা। এই আগ্রাসন নিয়ে মণিপুরে উপত্যকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। অন্য দিকে, বর্মা (বর্তমানে মায়ানমার), বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের মণিপুর ও মিজোরামের পাহাড়ি অংশ মিলিয়ে চিন-লুসাই হিল এলাকায় কুকি, নাগা ইত্যাদি জনজাতি ও তাদের নানা শাখার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বাস করে আসছেন। ১৮২৬ থেকে একাধিকবার ব্রিটিশরা ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে লাইন টেনে এই জনগোষ্ঠীর মানুষকে পরস্পরের থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। এই বিস্তীর্ণ এলাকার পাহাড়ের অধিবাসী জনজাতিরা বারবার এর বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে। যার সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ কুকি বিদ্রোহে। পাহাড়ি আদিবাসী জনগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন। আবার উপত্যকার সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধেও তারা লড়েছেন।

মণিপুর দীর্ঘদিন ধরেই নানা উপজাতি ও তাদের নানা শাখার বাসভূমি। সকলের উৎপত্তি এক উপজাতি গোষ্ঠী থেকে নয় এবং ভাষা-সংস্কৃতি-আচার আচরণেও পার্থক্য আছে। নানা সময়েই এই নানা উপজাতির মানুষের মধ্যে রক্তাক্ত লড়াইয়ের ইতিহাস মণিপুরে আছে। বর্তমানে ইম্ফলকে কেন্দ্র করে যে উপত্যকা তাতে মূলত বাস করেন মেইতেইরা। যারা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ। এই উপত্যকাকে ঘিরে থাকা পাহাড়ি এলাকায় কুকি, নাগা উপজাতি এবং তাদের বহু শাখার মানুষ বাস করেন। এ ছাড়াও কিছু বাংলাভাষী, নেপালিভাষী ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষের বাস আছে এই রাজ্যে। এখানে তাই সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার কাজটা অত্যন্ত জটিল এবং খুবই সংবেদনশীল।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একমাত্র আসামে কিছুটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। মণিপুরের মতো একেবারে প্রান্তিক এলাকায় তার প্রভাব ছিল খুবই দুর্বল। ফলে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত মানুষের মধ্যে সমস্বার্থ বোধ গড়ে তোলা, তাকে ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে মানুষকে শামিল করার চেষ্টা স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসমুখী নেতাদের দ্বারা পুরোপুরি অবহেলিত হয়েছে। এ কারণেই মণিপুরে ভারতীয়ত্ব, সমস্ত উপজাতির মধ্যে ভারতীয় হিসাবে একই পরিচয়-বোধ গড়ে ওঠার কাজে ঘাটতি থেকে গেছে। মণিপুরের এই পরিস্থিতি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে আবার প্রমাণ করছে— মহান লেনিন দেখিয়েছেন, বর্তমান যুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়ারা নেতৃত্বে থাকলে তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ করতে অক্ষম। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল মূলত আপসকামী বুর্জোয়ারা। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এই আপসকামী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দিক থেকে এক জাতি গড়ে উঠলেও জাতপাত-প্রাদেশিকতা-উপজাতিগত পরিচিতির বিভেদ, ভাষাগত বিভেদ ইত্যাদি দূর করে সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। মণিপুরে এই সমস্যা খুবই প্রকট।

২০২৩-এর ১ জুলাই মণিপুরের এক শিক্ষাবিদকে উদ্ধৃত করে দ্য টেলিগ্রাফ লিখেছিল, বিজেপি মেইতেই মায়েদের বুঝিয়েছিল— কুকিদের হাতে উপত্যকার সব জমি, চাকরি দখল হয়ে যাবে। তাই সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তাদের পাঠাতে হবে কুকিদের বিরুদ্ধে লড়তে। পুলিশ পিছন থেকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে কুকিরাও সশস্ত্র। তাদের যেমন প্রাণ যাচ্ছে, মেইতেই যুবকরাও প্রাণ হারাচ্ছেন।

কিন্তু এই কাজটা যে অসম্ভব ছিল না তা বোঝা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবারে শেষ ভাগে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার প্রতিনিধি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বের প্রতি মণিপুরের মানুষের সমর্থন দেখে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাথে সুভাষচন্দ্র নিজে মণিপুরে গিয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। সে রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আইএনএ বাহিনীকে সমর্থন শুধু নয়, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। মেইতেই, পঙ্গল, কুকি, নাগা সকলেই আইএনএ বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই তাদের মধ্যে ঐক্য সংহতি সহমর্মিতা গড়ে দিয়েছিল। ১৯৪৫-এ আইএনএ বাহিনী পিছু হটার সময় আইএনএ বাহিনীতে যোগ দেওয়া মণিপুরের দু'জন মহিলা ও ১৭ জন পুরুষ রেঙ্গুন থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। এই রাজ্যের নাগা অধ্যুষিত এলাকার নেতা অনগামি ঝাপু ফিজো ১৯৪৪ সালে আইএনএ-তে যোগ দেন (সূত্র ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন, রাজনীতি ও সংগ্রাম, কৃষ্ণা বসু)।

স্বাধীন ভারতে শাসকদের ভূমিকা পরিস্থিতি জটিল করেছে

স্বাধীন ভারতে শাসক বুর্জোয়া দলগুলির নেতারা নিজেরাই নানা সম্প্রদায়, বর্ণ-জাতিগত বিভেদে আচ্ছন্ন। তারা কেন্দ্র এবং নানা রাজ্যে সরকারি গদিতে বসার তাগিদে নতুন ধরনের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি নিয়ে চলে। সারা দেশের খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ও সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে তারা এ ভাবে বাধা সৃষ্টি করে। এটা তাদের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণি নিয়োজিত অন্যতম দায়িত্ব। আঞ্চলিক পুঁজিপতিদের সাথে বৃহৎ বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির মালিক জাতীয় পুঁজির সাথে তুলনামূকভাবে দুর্বল আঞ্চলিক পুঁজির দ্বন্দ্বের ফলে যে আঞ্চলিক দলগুলি গড়ে ওঠে তারাও অঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতা, জাতপাতের বিভেদে মদত দেয়। এই দুই পক্ষই বিভেদ জিইয়ে রাখে, কখনও কখনও সাধারণ মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মণিপুরেও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মণিপুরের মাটিতে যে ধরনের জাতিগত-সম্প্রদায়গত বিভেদের উপাদান মজুত ছিল তাকে সহজেই জাতিদাঙ্গা লাগানোর কাজে ব্যবহার করতে পেরেছে এই শক্তিগুলি। ভারতের স্বাধীনতার পর মণিপুরের রাজারা প্রথমে রাজন্য শাসিত রাজ্য হিসাবে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও ভারত সরকার সামরিক শক্তির জোরে ১৯৪৯-এ তার ভারতভুক্তি ঘটায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারায় যেহেতু মণিপুর ছিল না, তাদের বিশেষ অবস্থানকে ঘিরে রাজ্যবাসীর মধ্যে ভারতীয়ত্ব গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। মণিপুরের মানুষের মধ্যে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (আইডেন্টিটি) হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কাজ করছিল। এটাকে দূর করতে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ৩৭১-সি ধারায় মণিপুরের জন্য কিছু বিশেষ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু কাশ্মীরে ভারত সরকার যেমন ৩৭০ ধারার কোনও মর্যাদা কোনও দিন রাখেনি, মণিপুরেও একই কাজ করেছে। মণিপুরের বিশেষ অবস্থানকে যথাযথ মান্যতা দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে রাজ্যের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা, সমগ্র ভারতের সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিলনে সাহায্য করার জন্য যে জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন তা এ দেশের কোনও সরকারি বুর্জোয়া দলের কাছে আশা করাই বৃথা। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসকদের বঞ্চনা, অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে জাতিবাদী-প্রাদেশিকতাবাদী বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলি কাজে লাগিয়েছে। এর ফলে কিছু সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী গড়ে ওঠে। মণিপুরের মানুষের মনের এই ক্ষত নিরাময় দূরে থাক, সব দলের রাজত্বেই কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছে কেবলমাত্র সামরিক শক্তির জোরে মানুষের এই সমস্যাকে দাবিয়ে রাখতে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন কংগ্রেস এবং এখন বিজেপি মণিপুরের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে সে রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় থেকেছে। মেইতেই জনগোষ্ঠী সে রাজ্যে সর্ববৃহৎ এবং বিধানসভার ৪০টি আসনের মধ্যে ৩০টিতেই মেইতেইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয়েই এই জনগোষ্ঠীর উগ্রজাতিবাদী শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে তাদের ত্রাতা সেজে ভোটে জেতার চেষ্টা করেছে। যতদিন গেছে বিজেপি আরও উগ্রভাবে এই কাজ করেছে। শাসকদলগুলির এই ভূমিকায় সে রাজ্যের নানা উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র সংঘাতের পরিস্থিতি ক্রমাগত বেড়েছে।

সাম্প্রতিক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূত্রপাত মেইতেই জনগোষ্ঠীকে 'এসটি' তালিকাভুক্ত করার প্রশ্ন নিয়ে। শাসক দল বিজেপি মেইতেইদের বুঝিয়েছিল এসটি তালিকায় সংরক্ষণ পেলে তোমাদের বেকারি ঘুচবে, তোমরা পাহাড়ে জমি কিনতে পারবে। অথচ, তারা বলছে না যে, সংরক্ষণের আওতায় থেকেও কুকি-জো জনজাতির মানুষকে বেআইনি পোস্ত চাষ ও জঙ্গল নির্ভর জীবন কাটাতে হয় কেন? কংগ্রেসও একই ভাবে মেইতেইদের শত্রু হিসাবে কুকিদের তুলে ধরেছে দীর্ঘসময়। বিজেপি সরকারের সদ্য পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসার মাত্র পাঁচ মাস আগে ছিলেন কংগ্রেসের সহসভাপতি। মেইতেইদের মধ্যে আশঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি এবং একই সাথে তাদের ত্রাতা সেজে ভোট কুড়োনোর জন্য বিজেপি সমগ্র কুকি সমাজের বিরুদ্ধে ড্রাগ চোরাচালানের অভিযোগ আনছে। এই সমস্ত অঞ্চলে আফিম চাষকে ভিত্তি করে এই সমস্যা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সমস্ত জনগোষ্ঠীকে এভাবে দাগিয়ে দেওয়া চলতে পারে কি? যদিও বিজেপির একাধিক নেতা এমনকি সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং-এর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধেও ড্রাগ চোরা-চালানে মদত দেওয়ার অভিযোগ আছে।

২০২৩-এর ১ জুলাই মণিপুরের এক শিক্ষাবিদকে উদ্ধৃত করে দ্য টেলিগ্রাফ লিখেছিল, বিজেপি মেইতেই মায়েদের বুঝিয়েছিল— কুকিদের হাতে উপত্যকার সব জমি চাকরি দখল হয়ে যাবে। তাই সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তাদের. পাঠাতে হবে কুকিদের বিরুদ্ধে লড়তে। পুলিশ পিছন থেকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে কুকিরাও সশস্ত্র, তাদের যেমন প্রাণ যাচ্ছে, মেইতেই যুবকরাও প্রাণ হারাচ্ছেন।

'অ্যাক্ট ইস্ট নীতি'র বিশেষ পরিকল্পনা

মণিপুর মিজোরামের মতো উত্তরপূর্বের

ছয়ের পাতায় দেখুন

অভিবাদন তোমাদের এই লড়াইকে

যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে ৩ মার্চ এআইডিএসও-র ডাকা ছাত্র ধর্মঘটকে প্রতিহত করতে পুলিশ এবং শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা একযোগে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছে তা টিভিতে দেখে অনেকেই শিহরিত হয়েছেন। অত্যাচারী শাসকেরা যুগে যুগে কী ভাবে গণআন্দোলনের উপর দমন-পীড়ন চালায়, এটা তারই আর একটা উদাহরণ। ৫ মার্চ টিভিতে অত্যাচারিত ছাত্রীদের দেওয়া বর্ণনাতে জানা গেল, ধর্মঘটের সমর্থনে পথে নামা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, গবেষক ছাত্রী সুশ্রীতা সরেন, তনুশ্রী বেজ, বর্ণালী নায়ক ও রানুশ্রী বেজকে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার মহিলা ওসি বেল্ট দিয়ে পিটিয়ে, বুটের লাথি মেরেই ক্ষান্ত হননি, উচ্চস্বরে গান চালিয়ে উল্লাস করেছেন, গুমখুনের ভয় দেখিয়েছেন, এমনকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়ে বলে সুশ্রীতাকে জাত তুলে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছেন, আর এই কুকীর্তিকে আড়াল করতে এই সমস্ত কিছুই তিনি করেছেন সিসিটিভি আওতার বাইরে— তখন লজ্জায়, ঘৃণায় রাজ্যবাসীর মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে অজান্তেই বহু মানুষের চোখে জল এসেছে। সকলেই ভেবেছেন, এ কোন সভ্য সমাজে আমরা বাস করছি, যেখানে একজন কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ অফিসার আন্দোলনকারী ছাত্রীদের উপর এমন নৃশংস অত্যাচার চালাতে পারেন! পদ ও ক্ষমতার নেশায় মত্ত মহিলা অফিসার শুধু সভ্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেননি, সাথে তিনি তার বিকৃত মানসিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন। নির্যাতিতাদের শরীরের ক্ষত হয়তো একদিন ঠিক হবে, কিন্তু এই ঘটনায় সমাজ মননে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তার উপশম হবে কীসে?

১১ মার্চ জেলায় জেলায় প্রতিবাদ দিবস

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

এসপ্ল্যানেড, কলকাতা

এমন একটা পাশবিক, বর্বরোচিত ঘটনা সামনে আসার পরও প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে একটা তদন্তের আশ্বাসও দেওয়া হল না! পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি এমন ঘটনার কথা অস্বীকার করে একে পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র বলেছেন। রাজ্য সরকারের দুঁদে অ্যাডভোকেট জেনারেল হাইকোর্টে ঘাম ঝরাচ্ছেন সুশ্রীতাদের ন্যায়বিচারের দাবি আটকাতে। রাজ্যের মানুষ আবারও চাক্ষুষ করছেন কী ভাবে ন্যায়বিচারের দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে।

মনে পড়ে কয়েক মাস আগের কথা— অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে কাতারে কাতারে মানুষ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গের ভেদাভেদ ভুলে পথে নেমেছে। লম্বা মিছিলে পা মিলিয়েছে, স্লোগান দিয়েছে, রাতের পর রাত রাস্তায় থেকেছে। অভয়ার ন্যায়বিচার এখনও অধরা। নির্যাতিতার মা-বাবা এখনও বিচারের দাবিতে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে ছুটে চলেছেন। অভয়ার ক্ষত এখনও আমাদের মন থেকে শুকিয়ে যায়নি। সময়ের সাথে সাথে অনেকেই অভয়া আন্দোলনের চেতনা বুকে ধারণ করেও ব্যস্ত কর্মজীবনে ফিরে গেছেন। ভেবেছেন একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

দঃ২৪ পরগণার মৈপীঠে প্রতিবাদী পোস্টার ছাত্রদের

কিন্তু সময়ের দীর্ঘ সরণি দেখাচ্ছে শাসক আজও তার অভ্যাস বদলায়নি। আগের মতো ঠিক একই কায়দায় সে প্রতিবাদের ভাষাকে স্তব্ধ করতে চায় গলা টিপে দম বন্ধ করে। আশার কথা, এমন ছাত্রছাত্রীরা আজও রাস্তায় আছে, যারা প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, শাসককে নির্ভীক কণ্ঠে গলা তুলে প্রশ্ন করে— 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' এরাই সকলের সামনে বিবেকের আয়না হয়ে দেখা দেয়। এরাই যুগে যুগে গণআন্দোলনের পতাকা বহন করে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, শাসকের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে এ ভাবেই বারবার ফিরে আসে কখনও নির্ভয়া কখনও অভয়া কখনও তনুশ্রী, রানুশ্রী, বর্ণালী, সুশ্রীতা নামে।

এদের দেখে গর্ব হয়, অনেক হতাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখায় ওরা। অনেক অত্যাচারেও ওরা মাথা নত করেনি। গণআন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে ওরা মরণপণ লড়াই করছে— এ একটা অসম লড়াই। একদিকে রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর একদিকে কিছু অকুতোভয় নিরস্ত্র মানুষ, যারা শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর।

সুশ্রীতা, তনুশ্রীরা আজ আর একা না। লাখো লাখো মানুষ পথে-প্রান্তরে নানা অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। এঁরা সকলেই পাশে আছেন। এদের অদম্য সাহস, বিপ্লবী স্পর্ধা সঞ্চারিত হবে অসংখ্য মানুষের মধ্যে। এ ভাবেই লাল আগুনের দাবানল জ্বলে উঠবে। সুশ্রীতাদের লড়াইকে অভিবাদন!

রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

ছাত্রীদের উপর মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার বর্বরতার প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১৩ মার্চ সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। কলকাতায় মৌলালি মোড়ের বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস (ছবি)।

জনস্বার্থ নয়, বিদ্বেষের রাজনীতিই পুঁজি শাসক দলগুলির

বিধানসভায় জাতের নামে বজ্জাতি, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনীতি শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ১১ মার্চ বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের বিজয়ী মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

তাঁর এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ভাবে নিন্দিত হয়েছে। ভোটে নির্বাচিত একজন বিধায়কের উদ্দেশ্যে এই ধরনের মন্তব্য সংসদীয় ভাবে শুধু নয়, সামাজিকভাবেও চূড়ান্ত অশোভন, ভদ্রতা-সভ্যতা-শিষ্টাচার বিরোধী। আর ধর্মের উল্লেখ করে এমন মন্তব্য তো বেআইনিও বটে। এই ধরনের বক্তব্য সেই বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটারদের প্রতিও চরম অসম্মান। এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার। স্কুল-কলেজের শিক্ষা থেকে, সামাজিক পরিবেশ থেকে যাদের এই বোধ গড়ে ওঠেনি, বা গড়ে উঠলেও সংস্কৃতি বিবর্জিত রাজনৈতিক ধারা চর্চার ফলে অবলুপ্তির পথে, তাদের সভ্যতার সহজপাঠ শেখাতে প্রতিবাদই একমাত্র রাস্তা। কিন্তু সেই প্রতিবাদ কি একই দোষে দুষ্ট হবে? প্রতিবাদের কি কোনও রুচি-সংস্কৃতির বাঁধন থাকবে না? তৃণমূলের কয়েকজন নেতা-মন্ত্রীর আচরণে সেই সংস্কৃতি বোধের ভীষণ অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যে ভাষায় এর উত্তর দিয়েছেন তাও অত্যন্ত আপত্তিকর।

প্রশ্ন জাগে, ভোটাররা কি এই সব হীন কাজের জন্য বিধায়কদের নির্বাচিত করেছেন? এই নোংরা তরজার জন্যই কি জনগণের পয়সায় মোটা বেতন ভোগ করছেন বিধায়করা? বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচিত বিধায়ক শুভেন্দুবাবু যে আন্দোলনের শহিদ বেদিতে প্রতি বছর ঘটা করে মালা দেন— ওই বেদিতে খোদিত আছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বীর শহিদদের রক্ত। আজ এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা বলার পর তাঁর কী কোনও অধিকার থাকে শহিদ বেদিতে মালা দেওয়ার?

বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিধানসভায় বলেছেন, আপনারা ধর্মীয় কার্ড খেলছেন। ধর্মের নামে জালিয়াতি করবেন না। আমি একজন হিন্দু। কালী পুজো করি। দুর্গা পুজো করি। তার সার্টিফিকেট কি আপনাদের কাছ থেকে নিতে হবে?

মমতা ব্যানার্জী যে হিন্দু তা ফলাও করে প্রচারের হেতু কী? তিনি কী কী পুজো করেন বিধানসভায় তা বলারই বা কী প্রয়োজন ছিল? তিনি প্রচার না করলেও রাজ্যের মানুষ তাঁর ধর্ম পরিচয় জানেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর হিন্দু পরিচিতি ঢাক পিটিয়ে প্রচার করছেন একেবারে ভোট রাজনীতির হিসাব কষেই। সেটা হল বিজেপিকে টেক্কা দেওয়া যে, তুমি একা হিন্দু নও। এই চাপান উতোর থেকে স্পষ্ট, উভয়পক্ষই চাইছে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন, যা তাদের হিসাবে ভোট রাজনীতিতে ভাল ফল দেবে।

উভয় দলের এই সাদৃশ্যের কারণ হল শ্রেণি সাদৃশ্য, পুঁজিপতি শ্রেণির দল হওয়ার কারণে আচরণগত সাদৃশ্য। আবার তাদের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য তার মূলে রয়েছে একজন সর্বভারতীয় বৃহৎ পুঁজির সেবক, অপরজন আঞ্চলিক পুঁজির আশীর্বাদধন্য। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পেছনে কাজ করে বুর্জোয়া শ্রেণি স্বার্থ। তাই দুটি দলের কারওরই জনস্বার্থ রক্ষায় কোনও ভূমিকা নেই। তাই এ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি, একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিজেপির কোনও প্রতিবাদ-আন্দোলন নেই। তেমনই কেন্দ্রের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে তৃণমূলেরও কোনও প্রতিবাদ-আন্দোলন নেই। তা হলে জনগণ তাদের সমর্থন করবে কীসের ভিত্তিতে? সেই জন্যই মানুষের ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়া, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিভাজনের রাজনীতি করা। ধর্ম তুলে এই ধরনের হুমকির পেছনে বিজেপির লক্ষ্য মুসলিম বিরোধিতার হাওয়া তুলে হিন্দু ভোট এককাট্টা করা। অন্য দিকে তৃণমূলের লক্ষ্য মুসলিমদের ত্রাতা সেজে মুসলিম ভোট অটুট রাখার পাশাপাশি নরম হিন্দুত্বের অস্ত্রে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্কে বিজেপির থাবা রুখে দেওয়া। রাজ্যে এখন এই দুষ্ট খেলাই চলছে রাজনীতির নামে। মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মতো শক্তির মাথা তোলার পিছনে বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএমের অ-বাম রাজনীতির পথে সরকার চালানোর ভূমিকা কম নয়। ক্ষমতা হারানোর পরও তাদের 'আগে রাম পরে বাম' স্লোগানে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই জমি পেয়েছে।

ভাল করে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনও সরকারি দলই বাস্তবে কোনও ধর্ম বর্ণের মানুষেরই ত্রাতা নয়। পুঁজিবাদী সরকার হল, পুঁজিপতি শ্রেণির সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার পাহারাদার, তাদের সেবাদাস। বিজেপি সর্বদা অন্য দলগুলিকে মুসলিম তোষণকারী বলে। বাস্তবে মুসলিমদের স্বার্থ কোনও সরকারই রক্ষা করেনি। সাচার কমিটির

সাতের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদের শিক্ষা থেকে

‘মার্ক্স আবিষ্কার করেছিলেন মানব ইতিহাসের বিকাশের সূত্র’

(১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ কার্ল মার্ক্সের সমাধিস্থলে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের শ্রদ্ধার্ঘ্য)

“গত ১৪ মার্চ বিকেলবেলা ঠিক পৌনে তিনটের সময়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত চিন্তাবিদের সকল চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটে গেল। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্যে তাঁকে একা রেখে একটু অন্যত্র গিয়েছিলাম আমরা, আর যখন ফিরে এলাম তখন দেখলাম নিজস্ব আর্মচেয়ারটিতে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি— তবে সে নিদ্রা ছিল তাঁর চিরনিদ্রা।

এই মানুষটির প্রয়াণে ইউরোপ ও আমেরিকার সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাসবিজ্ঞান উভয়েরই অপরিমেয় ক্ষতি হল। এই বিরাট প্রাণের মহাপ্রস্থানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল অতি দ্রুত তা অনুভূত হতে থাকবে।

জীবপ্রকৃতির বিকাশের নিয়ম যেমন আবিষ্কার করেছেন ডারউইন, তেমনই মার্ক্স আবিষ্কার করেছেন মানব-ইতিহাসের বিকাশের সূত্র। মতাদর্শের পর্দা পড়ে পড়ে আবরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এতকাল যা লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, মার্ক্স উদ্ধার করেছেন সেই সহজ-সরল সত্যটিকে— অর্থাৎ রাজনীতি-বিজ্ঞান-শিল্প-ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করার আগে মানুষের একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন হল খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় আর পরনের বস্ত্রের। অর্থাৎ জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক বৈষয়িক উপাদানসমূহের উৎপাদন এবং ফলত এক নির্দিষ্ট যুগকালের মধ্যে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভিত্তি, যার উপর বিবর্ধিত হয়ে উঠেছে একেকটি বিশেষ জনসমাজের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন-সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা, শিল্প এবং এমনকী ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত— আর

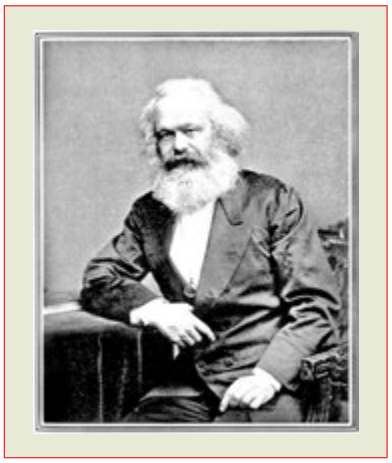

সে-কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত, এ পর্যন্ত যেমনটা হয়ে এসেছে তেমন উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু এই-ই সব নয়। আজকের দিনের পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং যে বুর্জোয়া সমাজ এই উৎপাদন-পদ্ধতির সৃষ্টি, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যে-বিশেষ গতিতত্ত্ব তারও আবিষ্কর্তা মার্কসই। যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় কী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, কী সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়পক্ষেরই পূর্ববর্তী সকল অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর সামিল হয়েছিল, উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কার একেবারে সহসা সেই সমগ্র সমস্যাটির উপর আলোকপাত করল।

এই জাতীয় দুটি আবিষ্কারই যে-কোনও মানুষের সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। এমন ধরনের একটি আবিষ্কারের সৌভাগ্যও যার হয়, সে মানুষ ধন্য। অথচ যেখানেই মার্ক্স গবেষণা চালিয়েছেন এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই (আর বলা বাহুল্য, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রও ছিল বহুবিচিত্র, আর কোনও ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের কাজ উপর উপর সারেননি তিনি), এমনকি গণিতশাস্ত্রেও, স্বনির্ভর স্বাধীন সব আবিষ্কার ঘটানোয় সক্ষম হয়েছেন।

এমনই ছিলেন এই বিজ্ঞানী মানুষটি। কিন্তু এটাও মানুষটির এমনকি অর্ধেক পরিচয়ও নয়। মার্ক্সের কাছে বিজ্ঞান ছিল ঐতিহাসিক দিক থেকে বেগবান এক বৈপ্লবিক শক্তি। কোনও একটি তত্ত্বগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোনও নতুন আবিষ্কার, হাতে-কলমে যার প্রয়োগের কথা হয়তো তখনও পর্যন্ত ধারণা করা রীতিমতো অসম্ভব ঠেকছে, তাকে যত খুশি হয়েই তিনি অভ্যর্থনা জানাতেন না কেন তাঁর আনন্দের প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের হত যদি ওই ধরনের কোনও আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত থাকত শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে অবিলম্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তনাদি ও সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশের ব্যাপারটি। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে আবিষ্কারগুলির বিকাশ এবং মার্সেল দেপ্রের সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহ গভীর মনোযোগে অনুধাবন করছিলেন তিনি।

কারণ, সবকিছুর উপরে মার্ক্স ছিলেন বিপ্লবী। জীবনে তাঁর সত্যিকার লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও সেই সমাজ যে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে যে কোনও প্রকারে তাদের উচ্ছেদে অবদান জোগানো আধুনিক যে প্রলেতারিয়েতকে তিনিই প্রথম তার নিজস্ব অবস্থান ও তার প্রয়োজনাদি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন, সচেতন করেছিলেন তার মুক্তির পক্ষে আবশ্যিক শর্তাবলী সম্পর্কে, তারই শৃঙ্খলমোচনে অবদান জোগানো ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সংগ্রাম ছিল তাঁর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। আর এমন প্রচণ্ড আবেগ, নাছোড়বান্দা ভাব আর সাফল্যের সঙ্গে তিনি লড়তেন যার তুলনা ছিল বিরল। রাইনসে জাইতুং প্রথম পর্ব (১৮৪২), প্যারিসের ইউওরেটস (১৮৪৪), ডিউস-ব্রাসলার জাইতুং (১৮৪৭), নিউ রাইনসে জাইতুং (১৮৪৮-৪৯) ও নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন (১৮৫২-৬১) পত্রিকায় তাঁর কাজ, তদুপরি প্রচুর সংগ্রামী প্রচার-পুস্তিকা রচনা, প্যারিস, ব্রাসেলস ও লন্ডনে সংগঠনগুলোর কাজকর্ম চালানো, পরিশেষে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন— একই সঙ্গে এ সবই নিষ্পন্ন করেছেন তিনি। বস্তুত, এই শেষোক্ত কাজটি এমনই একটি গৌরবময় কীর্তি যে এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা যদি আর কিছুই না করতেন তবে শুধুমাত্র এই কাজটির জন্যেই তাঁর গর্ব করা সাজত।

ফলত, মার্ক্স ছিলেন তাঁর কালের সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষের পাত্র, সবচেয়ে জঘন্য কুৎসা রটনার উপলক্ষ। একচ্ছত্র রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী উভয় ধরনের গর্ভনমেন্টই তাঁকে তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করেছে। রক্ষণশীল অথবা অতিগণতন্ত্রী যা-ই হোক না কেন, বুর্জোয়ারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতেছে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসাবর্ষণে। আর এ-সব কোনও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি, মাকড়সার জাল বা জঞ্জাল গণ্য করে উপেক্ষা করেছেন এদের, অত্যন্ত প্রয়োজনে বাধ্য হলে মাঝেসাঝে জবাব দিয়েছেন, এইমাত্র। আর আজ তিনি প্রয়াত— সাইবেরিয়ার খনি-অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সকল অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর শোক নিবেদনের উপলক্ষ তিনি। ভরসা করে এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে প্রতিপক্ষ বহু থাকলেও মার্কসের একজনও ব্যক্তিগত শত্রু ছিল কি না সন্দেহ।

যুগে যুগে স্থায়ী হবে ওঁর নাম, কীর্তিত হবে ওঁর কৃতি !

এআইডিওয়াইও-র বিহার রাজ্য সম্মেলন

৯ মার্চ বেগুসরাইয়ে দিনকর কলাভবনে এআইডিওয়াইও-র চতুর্থ বিহার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেগুসরাই স্টেশন থেকে যুব প্রতিনিধিদের সুদৃশ্য মিছিল নানা পথ ঘুরে কলাভবনে পৌঁছায়।

সেখানে প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত নৃত্য পরিচালক অধ্যাপক সুদামা প্রসাদ। বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক মণিকান্ত পাঠক, অধ্যাপক শিবশঙ্কর প্রসাদ সিং, অধ্যাপক রামচন্দ্র চন্দেশ, বিজয়কান্ত ঝা, সমাজকর্মী বি বি প্রকাশ, সন্তোষ কুমার ঈশ্বর, রবীন্দ্র কুমার নিরালা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অরবিন্দ কুমার।

বক্তারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আমন্ত্রিত বক্তা এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং তাঁর বক্তব্যে দেখান, বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি ইত্যাদি সমস্যার উৎস পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অমরজিৎ কুমার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক।

সম্মেলনে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট বিহার রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড সরোজ কুমার সুমন, সম্পাদক কমরেড বিকাশ কুমার।

ঘাটশিলায় বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

‘বুরুডিহি মুরাডিহি বাঁধ সংযুক্ত গ্রাম সভা সমিতি’র উদ্যোগে কানহো মুর্মুর শহিদ দিবস উপলক্ষে ১ মার্চ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাসের নেতৃত্বে ঘাটশিলার বুরুডি হ্রদের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। এলাকার চারটি গ্রাম থেকে আসা তিন শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করা হয়। তাঁদের হাতে ওষুধপত্র তুলে দেওয়া হয়।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের অন্যতম সংগঠক ডাঃ সামস মুসাফির বলেন, এখানকার বেশিরভাগ রোগীই অপুষ্টিতে আক্রান্ত। তাঁরা চর্মরোগ ও মাদক আসক্তিজনিত জটিলতাতে ভুগছেন যা তাঁদের দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মেডিকেল টিমের সাথে আলাপচারিতায়, আয়োজকরা এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন।

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ সহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অন্তর্গত সমস্ত কলেজগুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে ১২ মার্চ এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সাগরিকা দাস, সোয়েল সামাদ শেখ, সুরজিৎ সরকার প্রমুখের নেতৃত্বে উপাচার্যকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পাঠকের মতামত

বৈষম্য বেড়েই চলেছে

আমাদের দেশে বেকার সমস্যা একটা বড় সমস্যা। এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য, কাজ দেওয়া তাদের কাজ নয়। আর একটি সমস্যা হল, লাফিয়ে জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি। এ ক্ষেত্রেও সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আসলে সরকারের কাজটা কী তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে। শিল্পপতিদের যেমন উপাদানের বাজারে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকে, ফলে কম ব্যয়ে তারা উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। আবার গড় মুনাফা মার্জিন ঠিক করার ক্ষেত্রে তারাই একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রেও তাদেরই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ। তাদের মুনাফা বৃদ্ধি গত ১৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বেড়েছে তীব্র আয় বৈষম্য। দেশে মানুষ পিছু উৎপাদন প্রায় ২.৫ গুণ বেশি হয়। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি হলে দাম কমে কিন্তু এত উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। আবার মূল্যবৃদ্ধি থেকে পিছিয়ে বেতন। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে ঠেকেছে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের প্রায় ১০০ কোটি মানুষের বাস্তবিকই ক্রয়ক্ষমতা নেই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ বারের বাজেটে অন্যতম লক্ষ্য জনগণের পকেট ভরানো। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে এবং তীব্র বাজার সংকট অব্যাহত। তাই কোনও রকমে বাজারকে টিকিয়ে রাখার জন্য মধ্যবিত্তদের কর ছাড় দিয়ে বাজারে কিছুটা টাকা আনার চেষ্টা করছেন।

বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট বেসরকারি নার্সিংহোম কিছু দিনের মধ্যে তার শাখা বিস্তার করেছে বিভিন্ন জায়গায়। বিনিয়োগের এত টাকা আসে কোথা থেকে? আসে শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে। চারজন কর্মীর কাজ তারা একজনকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে, বেশি সময় খাটিয়ে নেয়। টেস্টগুলোর দাম নিজেদের মতো ঠিক করে। একটি ইউএসজি করতে ১৪০০ টাকা নেয়। এর কোনও হিসেব জনসাধারণের কাছে নেই। একটি ইউএসজি করতে কী কী জিনিস লাগে? ডাক্তারি ফি সহ এর উৎপাদন খরচ কত তার হিসাব কাউকেই দিতে হয় না। নিজের মতো করে তারা দাম ঠিক করে এবং মুনাফা লোটে। অন্য দিকে আবার ব্যবসা চালানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে কর ছাড় পায়, ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের টাকা পায়। আবার শোধ করতে না পারলে তা 'রাইট অফ' হয়ে যায় অর্থাৎ ঋণ মকুব। এমনি করেই চলছে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারের এই মনোভাব যতদিন না বন্ধ হয় ততদিন পর্যন্ত শুধু সরকার বদলে বদলে ভোটের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। আর এখন ভোটের ইস্যু তো বেকার সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, খয়রাতি হিসাবে জনগণকে কে কত টাকা দিতে পারবে এই প্রতিযোগিতাতেই ভোট হয়ে যাচ্ছে। আর এই টাকার জোগান যারা করে দেয় নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তাদের প্রতি 'দরদ' সরকারকে তো দেখাতেই হবে। ফলে তারা ইচ্ছামতো দাম ঠিক করবে, মুনাফার পাহাড় তৈরি করবে, আয় বৈষম্য বাড়াবে, আর সরকার চুপ করে থাকবে। অন্য দিকে সাধারণ মানুষকে বলবে, বর্ধিত দামের জিনিস কেনার জন্য আরও পরিশ্রম করো, আরও পরিশ্রম করো।

গৌতম দাস, মালদা

মণিপুর

তিনের পাতার পর

রাজ্যগুলির রাস্তা ধরে ভারতের একচেটিয়া পুঁজির মালিক ও বিদেশি বহুজাতিকদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা দেখে ২০১৫ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির কথা বলতে থাকে। তার স্বার্থে পাহাড়ের বাসিন্দা উপজাতিদের ক্ষোভ নিরসন দরকার হয়ে পড়ে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮-তে ভারত, মায়ানমারের সীমান্তের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে পাহাড়ি জনজাতিদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে 'ফ্রি মুভমেন্ট' হিসাবে দুই দেশে ছড়িয়ে থাকা তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে যাওয়ার জন্য ভিসা ছাড়াই বিশেষ অনুমতি নিয়ে যাতায়াত ও ৭২ ঘন্টা থাকার সুযোগ দেয়। কিন্তু একই সাথে বিজেপি তার ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে ২০১৭-র বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারাতে মেইতেই ভোটব্যাঙ্ক তৈরিতে জোর দেয়। তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের প্রবল ক্ষোভকে কাজে লাগায় এবং মেইতেইদের ত্রাতা সেজে প্রচার করতে থাকে কুকিরা উপত্যকার জমি নিয়ে নেবে, ওদের সংখ্যা বাড়ছে ফলে ওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে ইত্যাদি। প্রচার চলে, কুকিরা সকলেই বহিরাগত, ওদের দেশ থেকে বার করে দিতে হবে। তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, ১৯৫১-র সেন্সাসের ভিত্তিতে এনআরসি চালু করে বড় অংশ কুকি-জো মানুষকে ভারত থেকে বার করে দেওয়া হবে। এই অনুসারে ২০২১-এর জুলাই-এ 'ফ্রি মুভমেন্ট' অনুমতি প্রত্যাহার করার ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ২০২২ থেকে তা বন্ধ (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫)। মায়ানমারে অস্থিরতার কারণে জনজাতির কিছু মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসে থাকলেও তাদের চিহ্নিত করা ও আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টির সমাধান এক জিনিস, কিন্তু কুকি জনজাতিভুক্ত সমস্ত মানুষকে বহিরাগত বলে যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি তা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। কুকি জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবেই মণিপুরের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এবং ভারতীয় নাগরিক। তাদের সকলকে বহিরাগত বলার ফলে কুকিদের মধ্যে ক্ষোভকে কাজে লাগাচ্ছে সেখানকার উগ্রজাতিবাদী শক্তিগুলি। পরিস্থিতি এমন যে, এখন 'মণিপুরি' সত্ত্বার খোঁজ পাওয়াই মুশকিল— হয় সেটা মেইতেই সত্ত্বা, না হলে কুকি সত্ত্বায় বিভক্ত হয়ে গেছে।

সব জনগোষ্ঠীই পুঁজিবাদী শোষণের শিকার

বাস্তব হল, মণিপুরে কোনও জনগোষ্ঠীই আর এক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সুযোগ কাড়ছে না। তারা সকলেই শোষিত, অবহেলিত, বঞ্চনার শিকার। স্বাধীনতার পর থেকে শিল্প-কারখানা এবং অন্যান্য উন্নয়নের প্রশ্নে উত্তরপূর্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পিছিয়েই থেকেছে। বর্তমান অস্থিরতা শুরুর ঠিক আগের তথ্য দেখাচ্ছে, মণিপুরের জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাত্র ৩২ শতাংশ কিছু কাজ পায় (দ্য টেলিগ্রাফ ৫.৩.২০২২)। সরকারি-বেসরকারি নির্দিষ্ট বেতনের স্থায়ী কিংবা ক্যাজুয়াল চাকরি মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ২৭.৮ শতাংশ। মণিপুরে শিল্প অতি নগণ্য, সরকারি চাকরিও খুব কম। সংরক্ষণের আওতায় থেকেও পার্বত্য জেলাগুলির আদিবাসী মানুষের মধ্যে দারিদ্র এবং কর্মহীনতার মাত্রা অতি তীব্র। সে রাজ্যের সব জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ যুব বয়সীকে কাজ খুঁজতে দেশের নানা স্থানে পাড়ি জমাতে হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধুরন্ধর মতলববাজরা কংগ্রেস বিজেপির মতো শাসকদল ও প্রশাসনের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে মানুষকে লড়িয়ে দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করছে।

আগুন জ্বালিয়েছে মতলববাজ দলগুলি

গত বিধানসভা ভোটের আগে মণিপুরের কুকি-জো ইত্যাদি আদিবাসীদের কাছে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের জঙ্গল ও জমির অধিকার এবং অন্যান্য দাবির বিষয়টি তারা দেখবে। যার ভিত্তিতে ৭ জন কুকি বিধায়কও পেয়েছে তারা। কিন্তু ভোটের কিছুদিন পর থেকে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরে পাহাড়ে এবং বনাঞ্চলে মায়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী খোঁজার অছিলায় ভারতীয় নাগরিক আদিবাসী জনগণকে স্বাভাবিক এবং আইনগত অধিকার দিতে অস্বীকার করছে। তারা বহু গ্রাম উচ্ছেদ করার কাজ শুরু করেছে। সংবিধানের ৩৭১-সি ধারা এবং আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি অকেজো করে রেখে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণা করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করতে অভিযান চলছে। সাম্প্রতিক বনসুরক্ষা বিধির নামে আদিবাসীদের থেকে অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও পাহাড়ি জনজাতিগুলিকে বিক্ষুব্ধ করছে। মূলত কুকি জনজাতিদের বেশ কিছু গ্রাম সরকার উচ্ছেদ করেছে বা উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। সে রাজ্যের খনিজ এবং বনজ সম্পদ ও জমির ওপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। যাতে বৃহৎ পুঁজিমালিক কর্পোরেট কোম্পানিগুলি এই এলাকার জমি ও খনিতে থাবা বসাতে পারে।

এ সবের ফলে পাহাড়ি জনজাতিদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ ও ক্ষোভ দানা বাঁধছে। এর সুযোগ নিয়ে কুকিদের ম্যধ্য কিছু উগ্র জাতিবাদী শক্তি বিষ ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে, পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং-কে মেইতেই স্বার্থের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তুলে ধরে বিজেপি দেখাতে চেয়েছে যেন, কুকি সহ অন্যান্য অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষই মেইতেইদের বেকারত্ব, দারিদ্রের জন্য দায়ী। এই মিথ্যা প্রচারের জোরে শান্তিপূর্ণ মেইতেই জনগণের মধ্যে কুকিদের সম্পর্কে প্রবল ক্ষোভ এবং বিষাক্ত শত্রুতার জন্ম হয়েছে। এই চক্রান্ত আরও একবার পরিষ্কার হয়েছে বিজেপির সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সম্প্রতি ফাঁস হওয়া এক অডিও কথোপকথনে। শোনা গেছে তিনি নিজেকে মেইতেই গোষ্ঠীর সশস্ত্র গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তুলে ধরছেন। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘ সময় ধরে নীরব দর্শক হয়ে বসে থেকেছে। আবার দেশ জুড়ে প্রবল সমালোচনার মুখে সমস্যা সমাধানের নামে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ভান করে তারা এমন কিছু কাজ করছে যাতে কুকি-মেইতেই বিরোধ বাড়ছে। আসামে এক সময় বিদেশি বাছাইয়ের নামে একদল ভারতীয় নাগরিককে উচ্ছেদের চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই রকমই বিষাক্ত শত্রুতার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। এর ফলে আসামে রক্তাক্ত জাতিদাঙ্গার যে মারাত্মক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল তারই একটা বর্ধিত প্রতিচ্ছবি মণিপুরে এখন দেখা যাচ্ছে।

দুঃখের হলেও সত্য, সিপিএম, সিপিআই এবং নকশালপন্থী বলে পরিচিত বামপন্থী নামধারী দলগুলির মণিপুর শাখা সেখানে সরকারের এই ভূমিকার বিরোধিতা করেনি। আর প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস, প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুর যাচ্ছেন না, এই প্রচার ছাড়া সরকারকে চাপ দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

জনজীবনের সাধারণ দাবিগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই রাস্তা

যে যুবকের কথা দিয়ে এই প্রতিবেদনের শুরু, তাঁর যন্ত্রণাকেই আবার স্মরণ করে বলতে হয়— শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির চক্রান্তে পা দিয়ে মণিপুরের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মূল্যবান জীবন ছারখার হয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার নতুন করে বিভেদ বাড়ানোর রাস্তা নিয়েছে। রাজ্যপাল সময়সীমা বেঁধে লুঠ করা অস্ত্র জমা দেওয়ার কড়া বিবৃতি দিলেও বিজেপির মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলি এই অস্ত্র জমা দিতে সরাসরি অস্বীকার করছে। সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সমস্ত রাস্তা খোলার নামে আদিবাসীদের এলাকায় জোর করে এলাকার বাইরের লোক ঢোকানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে মহিলারা রাস্তায় নেমেছেন। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের এলাকায় যখন যেতেই পারছেন না, রাজধানী ইম্ফলেও একই পরিস্থিতি! এই সময় সেনাবাহিনীর জোরে কিছু বাস চালিয়ে জটিলতা বাড়ানোর চেষ্টা দেখে বোঝা যাচ্ছে বিজেপি সরকার সমস্যার সমাধান আদৌ চায় না। তাই সমস্যা সমাধানে মণিপুরের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। এই ভ্রাতৃঘাতী বিষাক্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কুকি-জো, মেইতেই সহ সকল সম্প্রদায়ের খেটে-খাওয়া শোষিত মানুষের সাধারণ সমস্যা— বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষ-স্বাস্থ্যের সুযোগ কেড়ে নেওয়া, জমির অধিকার হারানো, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই-ই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

মণিপুরের সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আবেদন, সমস্ত উপজাতি ও গোষ্ঠীর সাধারণ সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তা সমাধানের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ গণকমিটি গড়ে অন্দোলনে এগিয়ে আসুন। সরকারকে বাধ্য করুন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। অন্যথায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও খেটেখাওয়া মানুষের পরস্পরের ওপর রক্তাক্ত আক্রমণ তাঁদের জীবনের সমস্যাকে বাড়াবে, শোষকদের হাতকেই শক্ত করবে।

ভারতের নির্বাচনে আমেরিকার টাকা কোথায় খরচ হয়েছে প্রকাশ্যে আনুক সরকার

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের আমলে ইউ এস এড (ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) সংস্থা ভারতে গত লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার বাড়াতে ২১ মিলিয়ন ডলার (১৮২ কোটি টাকা) খরচ করেছিল। ট্রাম্প এমনও ইঙ্গিত করেছেন যে, এই টাকা বাইডেন প্রশাসন মোদি নয়, অন্য কাউকে জেতানোর জন্য খরচ করে থাকতে পারে। স্বভাবতই এই মন্তব্য ঘিরে শোরগোল উঠেছে, বিজেপি আর কংগ্রেস পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছে।

বিজেপি বলছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে ২০২৩ সালে রাহুল গান্ধী ব্রিটেনে গিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর কাছে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছিলেন। বাইডেন জমানায় ভারতের মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার লঙ্ঘন, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ নিয়ে বারবার আমেরিকার নানা সংস্থা নয়া দিল্লিকে দোষারোপ করেছে। অতএব বিজেপির বক্তব্য হল— দুয়ে দুয়ে চার করলে বোঝা যায়, কংগ্রেসের ঝুলিতে ইউএসএড ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল।

কিন্তু বিজেপির ঝুলি কি ফাঁকা? ট্রাম্প সাহেব তো এও বলেছেন যে, মার্কিন সাহায্য এসেছে বন্ধু নরেন্দ্র মোদির কাছেই। যদিও মোদি এবং ট্রাম্পের নিবিড় সখ্যতা নতুন কিছু নয়, তাও আর্থিক লেনদেন নিয়ে নতুন করে এই 'বন্ধুত্বে'র স্বীকৃতিতে বিপাকে পড়েছে বিজেপি। দাবি উঠেছে, ভারতে ইউএসএডের কাজকর্ম নিয়ে মোদি সরকার সংসদে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক।

ইউএসএড কী? আমেরিকা সরকারেরই একটি সংস্থা, যারা বিভিন্ন দেশকে 'উন্নয়নে' সাহায্য করে। ১৯৬১ সালে তৈরি এই সংস্থা কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন দেশের সরকারি বেসরকারি সংস্থাকে সাহায্য করে আসছে। বলাই বাহুল্য, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন রাষ্ট্র এই 'সাহায্য' বিনা প্রতিদানে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য থেকে করছে না। তা হলে করছে কেন? ভারতে নানা প্রকল্পে মূলত ইউএসএডের মাধ্যমে গত ছয় দশকে ৫৫৫টি ক্ষেত্রে ১৭০০ কোটি ডলার অর্থসাহায্য করেছে মার্কিন প্রশাসন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সময় সরকারে আসীন ছিল কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্নেহধন্য দলগুলো। গত বছর ২৬ জুলাই অর্থ মন্ত্রকের দেওয়া ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টেই (পিটিআই প্রকাশিত) উল্লেখ রয়েছে যে ইউএসএডের ৭৫০ মিলিয়ন ডলার বাজেটের ৭টি প্রকল্প চলছে ভারতে। অথচ, এই রিপোর্টের একটি প্রকল্পও ভোটের হার বাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত নয়। তা হলে কোথায় কী উদ্দেশ্যে খরচ হল এই বিপুল পরিমাণ টাকা? নরেন্দ্র মোদি কথায় কথায় ভারতের মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির গল্প শোনান। তা হলে একটি স্বাধীন এবং বিজেপি কথিত 'আত্মনির্ভর' দেশের নির্বাচনে এতখানি বিদেশি পুঁজির প্রয়োজনই বা হল কেন?

বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত দুই দলের মধ্যে চাপান উতোর যাই চলুক, মার্কিন ডলার আসার অভিযোগ কিন্তু বিজেপি বা কংগ্রেস কেউই অস্বীকার করতে পারেনি। কাজেই, ঝুলিতে বিড়াল আছে এ কথা পরিষ্কার। নির্বাচনে টাকার খেলা আজ আর অন্য অনেক দেশের মতোই এ দেশে নতুন কিছু নয়। দেশের ভোটসর্বস্ব দলগুলো যে পুঁজিপতিদের টাকায় ক্ষমতায় এসে তাদেরই স্বার্থরক্ষা করে এ-ও আজ বহু মানুষের জানা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি বক্তৃতায় যে গণতন্ত্রের গর্ব করেন, বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে যে গণতন্ত্র রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, বুর্জোয়া রাজনীতির পরিভাষায় নির্বাচন তো সেই 'গণতন্ত্রের উৎসব।' তা হলে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও মেনে চললে, নির্বাচনের খরচ-খরচা সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষকে জবাবদিহি করতে তারা বাধ্য। তাই মানুষের দাবি, সত্য প্রকাশিত হোক। নাগরিক সমাজ জানতে চায়, বিদেশি টাকা ভারতের নির্বাচনে কোথায় কতখানি কী ভাবে ব্যবহার হয়েছে, কারাই বা এ থেকে লাভবান হয়েছেন তা প্রকাশ্যে আনা হোক।

জনস্বার্থ নয়, বিদ্বেষের রাজনীতিই পুঁজি শাসক দলগুলির

চারের পাতার পর

রিপোর্ট সেটাই দেখিয়ে গেছে। মুসলিম স্বার্থের কথা বলে তারা তাদের ভোট নিয়েছে। আর এই রাজ্য সরকারগুলি ভোটব্যাঙ্ক তৈরির স্বার্থে যত মুসলিম প্রীতি দেখায়, তত বিজেপির পক্ষে সুবিধা হয় মুসলিম বিরোধিতার আবহ তৈরি করে হিন্দু সেন্টিমেন্ট খুঁচিয়ে তোলা। তার ফলে যে বিভাজন এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হয় তার সবচেয়ে বেশি কুফল বর্তায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপরেই।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। তাতে লাভের শতাংশ হিসাব কষেই এই খেলায় নেমেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল। এতে কার লাভ, কার ক্ষতি? লাভ শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির, তারা নিশ্চিন্তে জনগণের উপর তাদের শোষণের স্টিম রোলার চালিয়ে যায়। আর লাভ শাসক দলগুলির। তারা নিশ্চিন্তে জনবিরোধী কাজগুলি চালিয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি শোষিত সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ যে হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত সেগুলোর সমাধানের দাবিতে লড়াই পিছনে চলে যায় সাম্প্রদায়িক তরজায়। ধর্মীয় বিভেদ উস্কে দিয়ে জীবনের সব সমস্যা ভোলানো হয়। ধর্মীয় বিভেদ জনগণের জীবন ও জীবিকা রক্ষার আন্দোলনকে দুর্বল করে। অথচ পুঁজিবাদী শোষণ জাত-ধর্ম মানে না। কোনও হিন্দু মালিক যেমন তার হিন্দু শ্রমিকদের বাড়তি সুবিধা দেয় না, তেমনই মুসলিম মালিকও মুসলিম শ্রমিককে বাড়তি সুবিধা দেয় না। পুঁজিবাদী এই শোষণ থেকে মুক্তির রাস্তা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস কোনও সরকার করে দেবে না।

এর থেকে মুক্তির রাস্তা গড়ে তুলতে হবে ধর্ম বর্ণ জাত নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষকে যুক্ত করে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে। গণআন্দোলনের সুদৃঢ় ঐক্যই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারে। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) সেই গণআন্দোলনের রাস্তায় চলতে বদ্ধপরিকর।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কনভেনশন

একের পাতার পর

গ্রাহকদের বিক্রি করছে প্রতি ইউনিট গড়ে ১০ টাকায়, যদিও তারা কিনছে ৩.৭০ টাকা প্রতি ইউনিট দরে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ এখন রাজনীতির বিষয় হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের আগে কোন দল কত ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে কোন গ্রাহককে দেবে, তার প্রতিযোগিতা চলছে। বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারিকরণ, প্রি-পেড স্মার্ট মিটার ও জনবিরোধী নয়া বিদ্যুৎ বিল প্রতিরোধের দাবিতে ৪ মার্চ অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের পার্লামেন্ট অভিযান সংগঠিত হয়েছে। দিল্লির যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভ অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি স্বপন ঘোষ।

দেশের ২৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসা গ্রাহকদের সামনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কে ভেনুগোপাল ভাট, কার্যকরী সভাপতি সমর সিনহা, আসামের গ্রাহক-আন্দোলনের নেতা অজয় আচার্য, পশ্চিমবঙ্গের সুব্রত বিশ্বাস, ওড়িশার জয়সেন মেহের, বিহারের ললিত ঘোষ, দিল্লির রমেশ পরাশর ও ভাস্করানন্দ, হরিয়ানার মেহের বানজের, কর্নাটকের সোমশেখর, তামিলনাড়ুর অনাভরথন, পুদুচেরির শিবকুমার, মধ্যপ্রদেশের রচনা আগরওয়াল, ত্রিপুরার সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ গ্রাহক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। কনভেনশন থেকে আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ এবং ১ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন গ্রাহকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট মিটার ও বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে গ্রাহকদের পাশাপাশি বিদ্যুৎ শিল্পের কর্মচারীরাও লড়ছেন। এই কনভেনশন ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর কমিটি অফ ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এর আগামী ২৬ জুনের প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার এবং পাওয়ার সেক্টরের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও অল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স ফেডারেশনের পেট্রন কে অশোক রাও দুই ভারতের কথা বলেন। একটি ভারত যারা বিদ্যুতের দাম দিতে পারে, আর একটা ভারত যারা বিদ্যুতের দাম দিতে পারে না। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সার্ভে রিপোর্ট তুলে ধরে স্মার্ট মিটারের অকার্যকরিতার দিকগুলো ব্যাখ্যা করে দেখান তিনি।

অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অন্যতম উপদেষ্টা ও আসাম বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিমল দাস বলেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজ মানুষকে আন্দোলন করতে হচ্ছে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

তামিলনাড়ু ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ও তামিলনাড়ু পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির সভাপতি এস গান্ধী বলেন, স্মার্ট মিটার সার্ভার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে কর্মচারীদের কাজ চলে যাবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা, গ্যাস, তেল, জল, সূর্যালোক থেকে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তা নিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা করার জন্য বিদ্যুতের আইন করা হচ্ছে। শিল্পপতিরা শুধুমাত্র শহর এলাকাতেই বিদ্যুৎ বণ্টন করতে চায়, গ্রামীণ এলাকাতে নয়। স্মার্ট মিটার খারাপ হয়ে গেলে বা বহু টাকা কেটে নিলে কোনও ডিভিশনাল ম্যানেজার বা রিজিওনাল ম্যানেজার কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না, কারণ এই মিটার ভীষণভাবে 'স্মার্ট'। ভুল হচ্ছে বুঝলেও গ্রাহকদের কিছু করার থাকবে না। কারণ এটা প্রিপেড। অর্থাৎ এর টাকা আগেই জমা দিতে হয়। এই মিটার সরকারি বণ্টন কোম্পানি, সাধারণ গ্রাহক, কারও স্বার্থরক্ষা করবে না। এটা একমাত্র একচেটিয়া ব্যবসাদারদের বিপুল মুনাফা দেবে। আর তার মাশুল গুণতে সাধারণ হবে মানুষকে। ডিভিসি-র প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এ কে জৈন তাঁর চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গ্রাহক ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি আইনি লড়াইও দরকার। কনভেনশনের সভাপতি স্বপন ঘোষ আঞ্চলিক স্তরে প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 32 Bengali Weekly March 21, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, তাই গ্রেফতার করা হল দলের পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদককে

জৌনপুর মহোৎসব ও মুখ্যমন্ত্রী গণবিবাহ যোজনা উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের এলাকায় আগমনের একদিন আগে ১১ মার্চ এসইউসিআই(সি)-র পূর্ব উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্যকে কোনও কারণ না দেখিয়েই কুশহান বাজার থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। চরম নিন্দনীয় ও অগণতান্ত্রিক এই ঘটনার প্রতিবাদ করে ১২ মার্চ দলের প্রবীণ সদস্য কমরেড জগন্নাথ বর্মা এক প্রেস বিবৃতিতে অবিলম্বে কমরেড মৌর্যর মুক্তি দাবি করেন। পার্টি নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধিদল ওই দিনই বদলাপুরের উপজেলাশাসককে স্মারকলিপি দেন। আন্দোলনের চাপে ১২ মার্চ সন্ধ্যায় কমরেড মৌর্যকে হেফাজত থেকে মুক্ত করে পুলিশ।

জিন্দল হটাও ভিটেমাটি বাঁচাও

ওড়িশায় চাষি ও মহিলাদের বিশাল সমাবেশ

সম্প্রতি ওড়িশার বিজেপি সরকার কেন্দুঝর জেলার যমুনাপসি পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে এক মেগা স্টিল প্ল্যান্ট তৈরির চুক্তিতে সই করেছে শিল্পপতি জিন্দালের সাথে। অথচ এ ব্যাপারে কৃষকদের সাথে সরকার কোনও আলোচনাই করেনি। এর ফলে ১৭/১৮টি গ্রামের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ হতে হবে। সরকারের এই পদক্ষেপ নন্দীগ্রামে বহুজাতিক পস্কো কোম্পানির ও সিঙ্গুরে টাটাদের জমি দখলের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন স্থানীয় চাষিরা। এর প্রতিবাদে সংগঠিত হচ্ছেন তাঁরা।

১ মার্চ যমুনাপসি সাপ্তাহিক হাটে ‘জিন্দল হঠাও ভিটেমাটি বাঁচাও’ এই আহ্বানে বিশাল সমাবেশ হয়। এলাকার গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার চাষি, মহিলা, ছাত্র ও যুবক এই সভায় শামিল হন। কৃষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ঘনশ্যাম মাহাতোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস। তাঁর ভাষণে তিনি রাজ্য সরকার ও শিল্পপতি জিন্দলের জনস্বার্থবিরোধী চুক্তিপত্র অবিলম্বে বাতিল করা, কৃষিজমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, সরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার দাবি তোলেন। তিনি আরও বলেন, পুরুষানুক্রমে দখলে থাকা কৃষি ও বাসের উপযোগী জমি দখলদারকে পাট্টা না দিয়ে কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিজেপি সরকারের একচেটিয়া মালিকপ্রীতির আসল চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে। বক্তব্য রাখেন অচ্যুতানন্দ নায়েক, সরোজ কুমার সিংহ, রবীন্দ্র কুমার মাহাতো, প্রকাশ মল্লিক, বেণুধর সর্দার প্রমুখ। যতদিন না জিন্দল এই অন্যায় জমি দখল বন্ধ করে, ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে বলে তাঁরা জানান। সভা থেকে জিন্দল প্রতিরোধ মঞ্চ গঠিত হয়। ঘনশ্যাম মাহাতোকে সভাপতি ও বেণুধর সর্দারকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

উত্তরপ্রদেশে ছাত্রশিবির

এআইডিএসও-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এলাহাবাদে ৮-৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হল ছাত্রশিবির। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সহসভাপতি কমরেড শচীন জৈন, প্রাক্তন রাজ্য সহসভাপতি কমরেড রাজবেন্দ্র সিংহ, এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবী সইদ সিদ্দিকি প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন ‘ছাত্রজীবনে রাজনীতি করা উচিত কি?’— বইটি নিয়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা আলোচনার পর সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সৌরভ ঘোষ ও শচীন জৈন।

নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ

১৪ মার্চ এসইজেড বিরোধী নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাসে একটি কালো দিন। ২০০৭ সালের এই দিনে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ ও সিপিএম দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ১৪টি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছিল। বহু মানুষ নিখোঁজ হয়েছিলেন, যাদের খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সেই শহিদদের স্মরণে ১৪ মার্চ শহিদ দিবস পালন করল এস ইউ সি আই (সি) নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি।

উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতা কমরেড নন্দ পাত্র, জেলা-নেতা কমরেড ভবানীপ্রসাদ দাস, লোকাল সম্পাদক কমরেড মনোজ কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

ছাত্রীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ আইনজীবী সংগঠনের

ছাত্রীদের উপর মেদিনীপুরে কোতোয়ালি মহিলা থানার পুলিশ ৩ মার্চ যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার। ১২ মার্চ সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক, হাইকোর্টের আইনজীবী কার্তিক কুমার রায়ের নেতৃত্বে সহ-সভাপতি অবনী ঘোষ, অফিস সম্পাদক জায়েদ হোসেন, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাপীন বৈদ্য (কলকাতা হাইকোর্ট), সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজেশ গুপ্ত (আলিপুর পুলিশ কোর্ট) এর প্রতিবাদে রাজ্যের ডিআইজি সহ প্রশাসনিক কর্তাদের ডেপুটেশন দেন (ছবি)। বিভিন্ন কোর্ট থেকে ডিএম, মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, জনজাতি কমিশনে গণ-ইমেল করে এবং মিছিল ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়।

রেল-হকার ও বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে রেলমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ‘অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন’ ও ‘দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতি’র উদ্যোগে শিয়ালদা, খড়্গপুর, বিএনআর, আদ্রা ডিভিশনের রেল আধিকারিক (ডিআরএম)-এর কাছে দাবি সনদ পেশ করার পরে ৭ মার্চ বিকল্প জীবিকা ও বাসস্থানের জায়গা না দিয়ে রেল বস্তি ও হকার উচ্ছেদ বন্ধ সহ ১২ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দিল্লিতে রেল ভবনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দপ্তরে পেশ করা হয়।

সম্প্রতি খড়্গপুর কোলাঘাট সাঁতরাগাছি এবং আদ্রা শিয়ালদা ডিভিশনের ঘোষবাগান, শিয়ালদহ সাউথ ও নর্থ লাইন এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রেল হকার ও বস্তিতে আরপিএফের অত্যাচার ও রেল বস্তি উচ্ছেদের নোটিসের বিরুদ্ধে জীবিকা ও বাসস্থান হারানোর ভয়ে ভীত গরিব সাধারণ মানুষ ও হকারদের নিয়ে স্টেশনে স্টেশনে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। ডেপুটেশন টিমে অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক ও এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে কমরেড মধুসূদন বেরা ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি কমরেড শংকর মালাকার, সম্পাদক কমরেড গোপাল মাইতি, সদস্য কমরেড প্রদীপ দাস, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সেকশন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেন। মূল দাবি ছিল— ১) রেলের জমি ও রেলকে ভিত্তি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষার্থে রেলওয়ে ক্ষেত্রকে হকার আইন-২০১৪ প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ২) রেল বস্তিতে রেল সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) উপদ্রব বন্ধ করতে হবে। ৩) রেল বস্তি উচ্ছেদের নোটিস অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। ৪) রেল হকারদের উপর আরপিএফ-এর তোলাবাজি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com